প্রতিশোধ - অজেয় রায় Protishod by Ajeo Ray

ট্রাকটা যখন সিউড়ি পৌছল তখন সন্ধ্যে নেমে গিয়েছে। শহরের মধ্যে ঢুকে একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা থামিয়ে অন সিং বলল, মন্টু ভাই, আমরা এখানেই আস্তানা গাড়ব। আমার চেনা হোটেল। খানাপিনা ফাস ক্লাস। নাস্তা করে তুমি বেরিয়ে পড়ো তোমার দুশমনের খোঁজে।

দোতলায় একখানা ডবল বেড ঘর নেওয়া হল অর্জুন সিং আর মন্টুর জন্য। ট্রাকের খালাসি রামপ্রসাদ থাকবে নিচে। ঘরে নিজেদের জিনিসপত্র রেখে মুখ হাত ধুয়ে, চা-টা খেল তারা। তারপর মন্টু পথে বেরলো পায়ে হেঁটে। অর্জুন ট্রাক নিয়ে গেল কাছেই একটা গ্যারেজে রাখতে।

প্রায় কুড়ি বছর বাদে মন্টু সিউড়ি এল। অনেক বদলেছে শহরটা। ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে চলে মন্টু। অনেক পুরনো বাড়ি ভেঙে বড় বড় হাল ফ্যাশানের বাড়ি তৈরি হয়েছে। অনেক কাচা রাস্তা পাকা হয়েছে। সরু রাস্তা চওড়া হয়েছে। দোকানপাটও বেড়েছে প্রচুর। বেড়েছে রাস্তায় যানবাহন ও পথচারীর ভিড়। অনেক বকা মাঠ গ্রাস করেছে ঘরবাড়ি। মন্টু সাবধানে দু'পাশে নজর রেখে চলে। পুরনো কিছু কিছু বাড়ি, দোকান, গাছ ইত্যাদি খেয়াল করে এগোয়। নানান বাঁক ঘঘরে পথে। একটু একটু করে তারা গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি হতে থাকে। তারপর থমকে দাঁড়ায় একটা ঝকঝকে তেতলা বাড়ির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে

উথালপাতাল। মন্টু কাঠ হয়ে মোহাবিষ্টর মতো ওই বাড়িটা দেখে। নিচের তলায় একটা মস্ত সাইকেলের দোকান। ওপরের দুটো তলায় মনে। হল লোকের বাস।

এইখানেই ছিল। তবে এই বাড়ি নয়। মন্টুর মনে ভেসে ওঠে একটা একতলা পুরনো বাড়ির ছবি। পলস্তরা খসা দেওয়াল। বাড়ির সামনে ফালি জমিতে ফুলগাছের বাগান। মাঝখান দিয়ে সরু ইট বাধানো পথ। লোহার শিকে তৈরি গেট। যেখানে কেটেছে তার ছোটবেলার অনেকগুলি বছর। মন্টু ব্যাকুল হয়ে আশেপাশে তাকায়। ওই তো লাশ গাছটা আজও রয়েছে। বসন্তে ওর ডালে ডালে যেন আগুন জ্বলত কাছাকাছি আরও কয়েকটা বাড়ি দেখছি আজও একই রকম আছে। | প্রবল উচ্ছ্বাস চাপতে মাথা ঝিমঝিম করে মটুর। বহু আগেকার প্রায় মুছে যাওয়া কত ঘটনার স্মৃতি ক্রমে উজ্জ্বল হয়। কত আনন্দের স্মৃতি, কত বেদনার স্মৃতি তোলপাড় ঢেউ তুলে ধেয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা স্মৃতি, যা এতকাল দূরে থেকেও কখনও ক্ষীণ হয়নি। প্রায় প্রতিদিনই ঘটনাটা তার স্মৃতিপটে চাবুক মেরেছে। সেই প্রবল রাগ আর ঘৃণা ভরা স্মৃতিটা এখানে দাড়িয়ে মুহূর্তে লকলক করে শিখা তোলে। মাথার ভিতর ফের দল করে ওঠে প্রতিহিংসার আগুন। বিশ্বনাথ ওরফে বিশে গুভার কাকার আকৃতিটা ফুটে ওঠে। মনে।

বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স। মিশকালো রং। মোটা গোঁফ। কড়া কালো চুল। লোমশ ভুরুর নিচে নিষ্ঠুর দুটো চোখ। বিশাল দেহ। সর্বদা চমচ করে পান চিবুচ্ছে আর কষে পিচ গড়াচ্ছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। গলায় সোনার চেন। পনে দাই ধবধবে সাদা নিফিনে ধুতি পাঞ্জাবি। ওই মেয়ের মতো চেহারায় তাতে রূপটা আরও খোলতাই হত।

কোথায় সে? দমবন্ধ উত্তেজনায় মন্টু বিশ্বনাথকে দর্শনের আশায় চারধারে চায়। কিন্তু দেখতে পায় না। তারপরেই একটা কথা মনে হতে তার ইশ ফেরে।

এতকাল বাদে বিশ্বনাথকে দেখলে সে কি চট করে চিনতে পারবে? মন্টুকে দেখলেই কি আর এখনকার পুরনো লোকেরা চিনবে এক নজরে? বছর বারোর সেই রোগা পাতলা ভ্যাবলা ছেলেটা আর আজকের ছ'ফুট লম্বা, শক্তপোক্ত জোয়ান আর্ট যুবকটির মধ্যে কতটুকু মিল? তার সেই কিশোর মুখখানা কত ভেঙেচুরে গিয়েছে। টিকলো নাক এখন খাড়া। তার সেই বয়সের ফ্যাকাসে ফর্সা রং আজ রোদে জলে ঘুরে তামাটে। পাট পাট করে একপাশে আঁচড়ানো চুল ভোলা পাল্টে এখন ঘাড় ছোঁয়া, ঢেউ খেলানো। নাঃ, নিজে থেকে পরিচয় না দিলে আগের মন্টুকে যারা দেখেছে তারা এখন চিনতে পারবে না মোটেই।

এই বাড়ি থেকে পাঁচখানা বাড়ি তফাতে একটা চায়ের দোকান ছিল। সেখানেই অন্ডি মারত বিশে 'আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। কখনও দোকানের বেঞ্চি জুড়ে। কখনও সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হেন কুকাজ নেই তারা করত না। পাড়ার লোক তাদের যমের মতো ভয় পেত।

মন্ট পায়ে পায়ে সেই দোকানের দিকে যায়।

আরে সেই দোকানটা যে এখনও টিকে আছে! তবে ক্যাশবাক্সর পিছনে বসা সাধুচরণের জায়গায় এখন অন্য লোক। দোকানের ছিরি কিছুটা পাল্টেছে। বলা যায়, উন্নতি হয়েছে। কয়েকটি খদ্দের বসে আছে ভিতরে। কিন্তু খুঁটিয়ে নজর করেও বিশ্বনাথ বা তার চ্যালাদের সঙ্গে মেলে, এমন কাউকে সেখানে আবিষ্কার করতে পারে না মন্টু। সে ওই দোকানে ঢুকে এক কাপ চা খেল বেশ সময় নিয়ে। নাঃ, গুভা প্রকৃতির লোকের কোনো গুলতানি তার চোখে পড়ে না। নেহাতই নিরুপদ্রব পড়া।

বিশে গুড়া কি তার আমার জায়গা বলেছে? চায়ের দোকানে বিশ্বনাথের হদিশ জিজ্ঞেস করতে ভরসা হল না মন্টুর। কী জানি, যদি অন্য কিছু সন্দেহ করে। ফলে তাদের সব প্ল্যান যদি ভেস্তে যায়!

মন্টু ফিরে চলে হোটেলে। কত কথা ভাবতে ভাবতে ওই বাড়িতে এখনকার তেতলা নয়—সেই একতলা পুরনো বাড়িটায় জন্মেছিল মন্টু। ওইখানেই কেটেছে তার জীবনের বারোটি বছর। মন্টুর বয়স যখন সাত তখন তার মা চরম বিপাকে পড়েন। আত্মীয়স্বজন কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। কেউ আশ্রয় দিতে আহ্বান জানায়নি। হয়তো মায়ের বাবা বেঁচে থাকলে সেটুকু জুটত। মন্টুর মায়ের আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর। অনাহুতভাবে কারও আশ্রয়ে যেতে চাননি। ভালো সেলাই জানতেন তিনি। সেলাইয়ের অর্ডার নিয়ে আর স্বামীর সামান্য জমানো পুজি সম্বল করে কায়ক্লেশে সংসার চালাতে থাকেন। ছেলেকে পড়াতে থাকেন স্কুলে। কিন্তু তাও সইল না বরাতে। দুর্যোগ ঘনাল। মন্টুদের বাড়ির মালিক বাড়িটা হঠাৎ বেচে দিয়ে সিউড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। বাড়িটা কিনেছিল বিশ্বনাথ ওরফে বিশে গুন্ডা। বাড়িটার মালিক হয়েই সে মন্টুর মাকে নোটিশ দিল—এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এখানে সে দোকান করবে।

মন্টুর মা বাড়ি খুজতে থাকেন। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে তেমন কোনো বাড়ি মেলেনি সুবিধা মতো। ঠিক এক মাস বাদে বিশে দুই সারেন নিয়ে হাজির হল

তাগাদায়।

মন্টর মা মিনতি জানিয়েছিলেন, আর ক'টা মাস সময় দিন। কম ভাড়ায় এখানে বাড়ি পাইনি সহ্যাছি। এই পাড়ায় একজন কথা দিয়েছেন, তার বাড়িতে একটা ঘর খালি হবে ছ'মাস বাদে। সেটা আমায় দেবেন অল্প ভাড়ায়। আমার সামর্থ্য তো জানেন। কম ভাড়ায় পেলেও, বেশি দূরে যেতে সাহস হয় না। দূরে গেলে ছেলের ইস্কুলে যাওয়া আসা মুশকিল। তাছাড়া আমি প্রায়ই সেলাইয়ের অর্ডার নিতে, কাপড়-সুতো কিনতে বাইরে ঘুরি। ছেলেকে চেনাশোনা প্রতিবেশীদের ভরসায় একা রাখি। আর ক'টা মাস অপেক্ষা করুন।

নির্দয় বিশে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে এক চোট গালিগালাজ দিয়ে জানিয়েছিল, "ওঃ, আরও কটা মাস ? আবদার! আর পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি খালি করে দিতে হবে। নইলে কেস খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।" | মন্টুর মা তেজি মানুষ ছিলেন। এমন অভদ্র ব্যবহারে রুখে উঠে বলেছিলেন, 'আমি নিয়মিত ভাড়া দিচ্ছি। এমন জবরদস্তি করে আমাদের বাড়িছাড়া করতে পারেন না। দেশে আইন আছে।'

বটে, আইন দেখানো হচ্ছে? দে ঘর ফাকা করে। দেখি কে কী করতে পারে?

খেপে গিয়ে বিশে হুকুম করতেই তার দুই সাকরেদ টপাটপ ঘরের বাক্স বিছানা চেয়ার বইপত্তর তুলে বাইরে ছুড়ে ফেলতে শুরু করে।

মন্টুর মা কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব থেকে হাঁ হাঁ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন বাধা দিতে। কিন্তু তার আগেই বিশের হাতের এক ঝটকা মন্টুর মাকে আঘাত করে পাশে খাটের ওপর ফেলে দেয়। মন্টু আর থাকতে পারেনি। সে ঝাপিয়ে পড়েছিল বিশের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বিশের হাতের এক প্রচণ্ড থাপ্পড় খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল মেঝেয়। ক্ষণকালের জন্য রানও হারিয়েছিল রোগা-দুবলা ছেলেটা।

বিশ্বনাথ নির্মম হেসে কর্কশ স্বরে মন্তব্য করেছিল, "উচ্চিংড়েটার তো আস্পর্ধা কম নয়! যাকগে, আর পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি না ছাড়লে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। আইন-আদালত করলে কিন্তু ওই ছেলের লাশ পাওয়া যাবে মাঠে, এই বলে রাখছি।"

হুমকি দিয়ে ঘরের ছত্রাকার জিনিসে বারকয়েক লাথি মেরে ছিটকে ফেলে গটগট করে বেরিয়ে গিয়েছিল বিশে। পাড়ার লোক দূর থেকে ব্যাপারটা দেখেছিল। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি।

অপমানটা বড্ড বেজেছিল মন্টুর মায়ের বুকে। তবু তিনি ভয়ে পিছু হটার পাত্রী ছিলেন। হয়তো কোর্টে যেতেন সত্যি সত্যি। কিন্তু একমাত্র সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কায় সিউড়ি ছাড়লেন দিন কয়েক বাদে।

এই কদিনও রেহাই পায়নি মন্টুরা। সে বা তার মা বিশ্বনাথের আড্ডাখানা চায়ের দোকানটার সামনে দিয়ে গেলেই শুনতে হয়েছে তাদের উদ্দেশে কটুক্তি। সব তারা বুজে সরে গিয়েছে, না শোনার ভান করে।

সিউড়ি ছেড়ে মা ছেলে হাজির হয়েছিল মন্টুর খড়মামার কাছে হুগলিতে।

হুগলিতে পাঁচটা বছর বড় অনাদরে কেটেছিল মন্টর।

মন্টর বড়মামা ছাপোষা মানুষ। বাসা ছোট। মন্টুদের আগমনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। বিশেষত বড়মামি। সোজাসুজি চলে যেতে না বললেও, আকারে ইঙ্গিতে ক্রমাগত বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এই উটকো আপস বিদায় হলেই বীচি। মন্টুকে কেবলই উপদেশ দিতেন চটপট কোনো রোজগারের চেষ্টা করে। মন্টুর মা অবশ্য সেখানেও সেলাই করে যথাসম্ভব নিজেদের খরচ জোগাতেন। মাধ্যমিক পশে করেই তাই মন্টু মামারবাড়ি হাড়ে রোজগারের ধান্দায়, মায়ের অমতেই।

প্রথমে একজন ট্রাক ড্রাইভারের হেলার হয়ে বেরিয়ে পড়ে। বছর দুই নানা জায়গায় ঘোরে, নানান কাজ করে, যখন যা জুটেছে। তারপর কানপুরে থিতু হয়। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটা মোটর গ্যারেজে মোটর গাড়ির কলকজার কাজ শিখতে থাকে।

বহু কষ্ট সহ্য করে প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে সে একজন পাকা মোটর মেকানিক হিসাবে নাম কেনে। রোজগারও অনেক বাড়ে। এতদিন যখন যেটুকু পেরেছে মাকে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছে। তবে মামারবাড়ি গেছে কদাচিৎ। এবার সে মাকে নিজের কাছে কানপুরে এনে রাখে।

মন্টুর মা কিন্তু আর বেশিদিন বাঁচেননি। দুঃখে কষ্টে তার শরীর ভেঙে গিয়েছিল। শেষ জীবনে মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছিল ভেবে, মন্টুর হৃদয়

ভারি তৃপ্তি পায়। তবে একটা ব্যাপারে মন্টু নিশ্চিত—সিউড়ি থেকে ওভাবে অপমানিত হয়ে চলে আসার দুঃখময়। স্মৃতি কোনোদিন ম্লান হয়নি মায়ের মনে।

মা মুখে কিছু প্রকাশ করতেন না বটে, কিন্তু কখনও তাদের সিউড়ির জীবনের শেষ কটা দিনের প্রসঙ্গ তুলতেন না। যেন ওই দিন ক'টা ভুলে যেতে চাইতেন জোর করে। মন্টু সেকথা তুললেও কঠিন মুখে চুপ করে থাকতেন। যোগ দিতেন না কথায়।

একবার মন্টু উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেছিল, "জানো মা, ইচ্ছে করে একবার সিউড়ি যাই। গিয়ে শয়তান বিশের মাথাটা ডান্ডা মেরে ভেঙে দিয়ে আসি।"

শুনে আঁতকে উঠেছিলেন মা- "না খোকা, অমন মতলব করিসনি। ওখানে গিয়ে ওসব করলে তুই খুন হয়ে যাবি। অনেক কষ্টে দড়িয়েছিস। 'তুচ্ছ কারণে একটা বাজে লোকের ওপর শোধ তুলতে গিয়ে কেন নিজের জীবন নষ্ট করবি? সে আমি সইতে পারব না।' মা তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, একদিন ওরা পাপের শাস্তি ঠিক পাবে। আমি বিশ্বাস করি।

একা সিউড়ি গিয়ে বিশ্বনাথের ওপর ভালো মেটানোর হঠকারিতা করেনি মন্ট। কিন্তু সেই অপমানের কারণে দুরন্ত প্রতিশোধের ইচ্ছেটা তুষের আগুনের মতো তার নিরুপায় বুকে নিয়ত ধিকিধিকি জ্বলেছে। এতদিনে বুঝি বা সেই আশঙক্ষা মিটবে অর্জুন সিংয়ের দৌলতে।

হরিয়ানাবাসী অর্জুন সিং। বয়স চল্লিশের কিছু বেশি। বিশাল জোয়ান। দুর্ধর্ষ প্রকৃতি। এক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির পার্টনার সে। সারা ভারত চষে বেড়ায় ব্যবসার কাজে। দরকারে। নিজেও ট্রাক চালায়। দিব্যি বাংলা জানে। মন্টুর সঙ্গে পরিচয় কানপুরে। সরল পরিশ্রমী। যুবক মন্টুকে ভালো লেগেছিল অর্জুনের। কানপুরে এলেই সে মন্টুর সঙ্গে আড্ডা দেয়।

মন্টু একদিন কথায় কথায় অর্জুন সিংকে বলে ফেলেছিল, সিউড়িতে বিশে গুণ্ডার হাতে তাদের লাঞ্ছনার কাহিনি।

অর্জুন ফুসে উঠেছিল, এখনও তার বদলা নাওনি কেন?" মন্টু সখেদে জানায়, কী করব? সিউড়িতে একা গিয়ে শোধ তুলতে গেলে লাইফ রিস্ক। মায়ের বারণ। ইচ্ছে কি আর হয় না?"

সিংজি টেবিলে দড়াম করে এক ঘুসি বসিয়ে গর্জন ছেড়েছিল, “দোস্ত, আমায় আগে বলোনি কেন? আরে, কত আচ্ছা আচ্ছা গুন্ডা বদমাশের সঙ্গে আমার খাতির আছে। ওই বিশের মতো পাতি গুন্ডাকে সিউড়ি থেকে বেমালুম হাপিস করে এনে তোমার পায়ের নিচে ফেলার বন্দোবস্ত করে দেব। তখন বেটাকে যো খুশ কোরো। কোনো ডর নেই। এমন জায়গায় এনে ফেলব কেউ পাত্তা পাবে না। থানা পুলিশ হলে আমি সামলাব। সে হিম্মত আছে। অর্জুন গোঁফ চোষতে চোষতে গম্ভীর বদনে প্রশ্ন করে, তা দুশমনটাকে হাতে পেলে কী করবে? আমি বলি, একদম খতম করে দাও। 'না না, খুন নয়। আপত্তি জানিয়েছিল মন্টু।

ইচ্ছে হয় একা একা খালি হাতে একবার ওর টর্কর নিই। তারপর যে-হাতে ও আমায় চড় মেরেছিল, যে হাতে ও আমার অসহায় মাকে ধাক্কা মেরেছিল, সেই হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিই।' বলতে বলতে মন্টু নিজের দুই পেশিবহুল হাত দু'খানায় চোখ বোলায়। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে।

অর্জুন সিং মন্টুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, 'বহুত আচ্ছা। এবার যখন সিউড়ি লাইনে যাব, তোমায় সাথ নেব। সেই বেতামিজ বিশেটাকে চিনিয়ে দিও। পরে ওকে তুলে এনে তোমার সঙ্গে লড়িয়ে দেব।

সেই উদ্দেশ্যেই সিউড়ি এসেছে অর্জুন সিং আর মন্টু।

হোটেলের কাছাকাছি এসে মন্টুর হঠাৎ মনে হল, ভরতের সঙ্গে একবার দেখা করি। ও কি এখনও বাসায় আছে?

ভরত সাইকেলরিকশা চালাত। মুলুক থেকে সদ্য আসা সহায়হীন যুবক ভরতকে মন্টুর বাবা কিছু সাহায্য করেছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা ভোলেনি ভরত। মন্টুদের খুব ভালোবাসত। মন্টুর মাকে রিকশায় ঘুরিয়ে অনেক সময় ভাড়া নিতে চাইত না। আর নিলেও নামমাত্র। যখন মন্টুর সিউড়ি তখন ভরতের বয়স বছর তিরিশ। স্টেশনের কাছে বউ-বাচ্চা নিয়ে বাস করত সে। গোপনে বিশ্বনাথের খবর জানতে ভরতই সব চাইতে নিরাপদ।

মন্টু হোটেলে ফিরল রাত ন'টা নাগাদ। অর্জুন সিং অপেক্ষায় ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'খবর মিলল?' “মিলেছে।' জবাব দেয় মন্টু। সংক্ষেপে ভরতের পরিচয় দিয়ে মন্টু বলে, ভরতের কাছে জেনেছি, বিশে গুন্ডার এখন হাল বেশ খারাপ। ওর গ্যাং ভেঙে গিয়েছে। টাকাপয়সাও উড়ে গিয়েছে। এখন থাকে শহরের

সীমানায় একটা ছোট্ট বাড়িতে। আমাদের আগের বাড়ি, সে বাড়ি অবশ্য এখন আর নেই, ভেঙে তিনতলা নতুন বাড়ি হয়েছে দেখলাম। সেটাও নাকি বিশের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। মালিক অন লোক। ও এখন শহরের ভেতর মোটে আসে না। হয়তো পুরনো শত্রুদের ভয়ে। চার-পাঁচ বছর ওকে চোখে দেখেনি ভরত। শুনেছে এসব। আমি ভরতকে ভার দিয়ে এসেছি বিশ্বথের গতিবিধির খোঁজ করতে। ও কাল আমায় জানাবেন।

সারাদিন হোটেল ঘরে কাটিয়ে, পরদিন বিকেলে মন্টু গেল ভরতের আছে। রাতে ফিরে অর্জুনকে রিপোর্ট করল—বিশ্বনাথ নকি বাড়ির বাইরে বেরোয় কদাচিৎ। তার কাছে লোকজন আসে খুব কম। একদম একা, নেহাতই নিরীহ জীবন কাটাচ্ছে। ওর দুই ছেলে বাইরে চলে গিয়েছে। তারা কখনও আসে না। বড় মরে গিয়েছে। কে বুড়ো ওর কাজ করে। ওই বুড়ো প্রত্যেকদিন সন্ধের সময় বাড়ির বাইরে যায়। আজাফাজ্জা মেরে ঘন্টা দুই কাটিয়ে ফেরে। রাতে ওই বাড়িতেই থাকে।

অর্জুন তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলল, “আরে এ আমি তো একদম ফালতু। তুমি সি লোকটাকে আমায় দেখিয়ে দাও। বাইরে না বেরোলে ওর কোঠিটা চিনিয়ে দাও। ব্যস, কাম ফতে। 'আমার লোক ঠিক ওকে গায়েব করবে।"

মন্টু একটুক্ষণ গুম মেরে থেকে লল, 'দেখো সিংজি, বাইরে নয়, আমি এখানেই বিশ্বনাথের সঙ্গে মোলাকাত করব ঠিক করেছি। ওর বাড়িতেই। ও আমাদের বাড়ি এসে আমায় আর মাকে অপমান করেছিল। আমিও ওর বাড়িতে গিয়ে সেই অপমানের শোধ নেব।”

সিংজি চমকে বলল, “আরে ভাই, এ কেয়া বাত?"

‘হ্যা, তাই করব। ওর দলবল যখন নেই, এ বিশ্বনাথের সঙ্গে মোগবিলাটা এখানেই হয়ে যাক। বাড়িটা আমি দেখে এসেছি। বেশ নির্জন। পাশে ঝোপঝাড়, বড় বড় গাছ। রাতে পাড়াটা একেবারে অন্ধকার নিঝুম হয়ে যায়। ওর বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট আছে, কিন্তু সামনে কাঁচা রাস্তায় এখন স্ট্রিট লাইট যায়নি। ওর কাজের লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর, অন্ধকার হলেই ওর বাড়িতে ঢুর। ভারতের রিকশায় যাব। বিশ্বনাথের বানির কাছাকাছি নেমে, হেঁটে গিয়ে ওর দরজায় নক করৰ। দরজা না খুললে জানলার শিক বাঁকিয়ে ঢুকব। শিকগুলো পলকা, দেখে এসেছি। বিশ্বনাথের উপর হাতের সুখ করে, ফের ভরতের রিকশায় চেপে চলে

আসব। আমি বেরোলেই, তুমি ট্রাক নিয়ে হোটেল ছাড়বে। আমার লাগেজ নিও। স্টেশনের কাছে লালজির ধাবায় অপেক্ষা করবে। আমি কাজ সেরে ফিরলেই, গাড়ি স্টার্ট দেবে। তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যে কোনো জায়গায় সুবিধে মতো আমায় নামিয়ে দিও। কটা মাস এদিক সেদিক লুকিয়ে থেকে কানপুরে ফিরব। গুরত ছাড়া এখানে কেউ আমায় চিনতে পারেনি। আমার কানপুরের ঠিকানাও কেউ জানে না। পরে জানাজানি হলেও, আমায় কেউ ধরতে পারবে না। আর ভরাত কাউকে বলবে না। তেমন বুঝলে না-হয় কানপুরে ফিরব না কয়েক বছর। হ্যা, একটু ছবেশ ধরতে হবে। মাথায় টুপি, চোখে গগলস, ফলস দাড়ি-মোচ—এতেই হবে। যাতে পরে পুলিশ পিছনে লাগলেও, বিশ্বনাথ আমায় না শনাক্ত করতে পারে। গানটা কী রকম?”

অর্জুন সিং এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, ‘প্ল্যান ঠিক আছে। লোকন হনতি তুমার সাথ যাব।'

“কেন?” মন্টু অবাক।

সিংজি গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মন্টু ভাই, এইসব শুভ বদমাশ বহত খতরনাক। তুমি তো খালি হাতে বদলা নিতে চাও। লেকিন ওই বদমাশটার কাছে অস্ত্র থাকতে পারে। পিস্তল, চাকু। ও যাতে সেটা না চালায়, আমি খেয়াল রাখব। ট্রাক রেডি থাকবে। কাম যাতে করে এসেই আমরা স্টার্ট দেব।' মন্টু খুঁত খুত করে, কিন্তু পরে তুমি যদি ঝামেলায় পড়ো? অর্জুন সিং ধমক দিল, “থ্যস বাস, সে আমি ম্যানেজ করব।'

পরদিন রাত নামতেই, মন্ট ও অর্জুন সিং শহরের সীমানায় এক জায়গায় ভারতের রিকশা থেকে নামল। জায়গাটায় সবে বসতি গড়ে উঠছে! অঘ্রানের অল্প পাতলা কুয়াশা জমেছে। আশপাশ শুনশান। শুধু খানিক দূরে একটা মুদির দোকানে মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে।

একটা ছোট অন্ধকার মাঠ পেরল দু'জনে। মাঠের গা ঘেষে কাচা রাস্তা। রাস্তার ধারে তফাতে কিছু বাড়ি। তবে লোক নেই পথে। একটা ছোট একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে মন্টু দেখাল—এই বাড়ি।'

নিঃশব্দে দু'জনে বাড়িটার দরজায় কান পাতে। কোনো শব্দ নেই ভিতরে। তবে মৃদু আলোর রেখা কপাটের ফাক দিয়ে নজরে আসে। অর্জুন সিং একটা বড়

রুমাল বেঁধে নিল তার মুখে। চোখের নিচ অবধি ঢেকে। তার চোখেও মন্টুর মতো কালো গগলস। সে পাগড়ি পড়ে না। কিন্তু আজ বেঁধেছে। মন্টু দরজায় টোকা দেয় খটুখ।

‘কে? ভিতর থেকে প্রশ্ন হয়। ‘আস্তে দশরথ।' জবাব দেয় মন্টু।

বিশ্বনাথের বাড়িতে যে বৃদ্ধ কাজ করে তার নাম দশরথ। বাড়ির মধ্যে থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসে। দরজাটা খুলতে বেশ দেরি হচ্ছে। কিছু সন্দেহ রুল নাকি? হঠাৎ ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়। পাল্লা ফাক হতে হতে ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন হয়, তুই এত তাড়াতাড়ি?

মুহূর্তে কপাট ঠেলে ঘরে প্রবেশ করে মন্টু। ভিতরের লোকটির বুকে ছুরি ঠেকিয়ে, সে চাপা হিংস্র ণ্ঠে গজায়, “খবরদার। চেঁচালেই মরবে।'

মন্টুর পিছন পিছন ঘরে ঢুকে কপাটে ছিটকিনি তুলে দেয় অর্জুন সিং। ‘আঁ আঁ..' আর্তস্বর বের হয় বিশ্বনাথের গলায়। ‘চোপ্। ফের ধমকায় মন্টু।

ভয়ে স্তব্ধ হয় বিশ্বনাথ। সিংজি খপ করে বিশ্বনাথের হাত দুটো পিছন থেকে বঙ্গমুষ্টিতে চেপে ধরে, তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় ঘরের মাঝখানে। তার সারা গায়ে হাত চালিয়ে পরখ করে নেয় যে ওর কাছে কোনো অস্ত্র আহে কিনা। এরপর মাথা নেড়ে মন্টুকে বোঝায় নেই স সিংজি এবার বিশ্বনাথকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছু হটে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তার নজর রাখে বিশ্বনাথের ওপর। মন্টু ও বিশ্বনাথ এখন মুখোমুখি। কুদ্ধ চোখে বিশ্বনাথ ওরফে বিশে গুতার দিকে চেয়ে থাকে মন্টু।

হির বিপ ভরা কথা শোনা যায়, 'এ ভরি, বুত য়ে জোড়া কন রে পিটা।

প্রতিশোধ। ১৯১ নেহি তো মার্ডার হোয়ে যাবে।”

মুট তখন এক চরম বিস্ময়ের মাঝে! আরে, সামনে এই লোকটা কে? এত বছর যে কাকের মতি মন্টুর হয়ে প্রীতি লা সৃষ্টি করেছে, যার ওপর প্রতিশোধের কামনায় অস্থির হয়েছে, এ তো সেই লোক নয়!

হ্যা, সেই লোকই বটে, কিন্তু কুড়ি বছর আগের সেই বিশে গুণ্ডা নয়। বরং বলা উচিত—এ বিশে গুন্ডার প্রেত ! একে এখন মন্টুর দেখা বিশ্বনাথ বলে চেনাই

কঠিন। কুড়ি বছর বড় কম সময় নয়। তবু এতখানি পরিবর্তন ভাবা যায় না!

কিঞ্চিৎ স্থল সেই বিরাট লম্বা চওড়া বন্ধুটা যেন শীর্ণকুৎসিত পোড়া কাঠ হয়ে গিয়েছে। ভাঙ পড়া চোপসালো গাল। কণ্ঠা বের করা সরু গলা। মাথায় আধপাকা পাতলা চুল। গোঁফ উধাও। মুখে অন্তত দু'দিন না-কামাননা সাড়ি। শরীর ধনুকের মতো বেকে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। একদা উদ্ধত চোখ দুটো কোটরে বসা, ঘোলাটে। আতঙ্কে বিস্ফারিত। থরথর করে কাপছে দেহ। বুঝি এখুনি পড়ে যাবে হাঁটু ভেঙে। বিশ্বনাথের পরনে ঢলঢলে আধময়লা পাবি ও লুঙ্গি। পায়ে বারের চটি।

মন্টু থ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিশ্বনাথ কাতর কণ্ঠে মিনতি জানায়, আমার কিছু নেই। আমায় মেরো না। নিয়ে যাও যা আছে। দয়া করো। | এই কটা কথা বলেই সে মুখ হাঁ করে ভীষণ হাঁপাতে থাকে। আরও কুঁজো হয়ে যায়। দু'হাতে চেপে ধরে নিজের বুক। বোঝা গেল যে—শুধু ভয়ে নয়, প্রচণ্ড। হাঁপানির টানে তার বাকরোধ হয়ে গিয়েছে। নিচু হতে হতে বুকি সে পড়েই যেত মেঝেতে। মন্টু ঝপ করে ওর কাধ আঁকড়ে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেয় একটা চেয়ারে। মরণ ফাঁদে পড়া জীবের মতো উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে বিশ্বনাথ সশব্দে লম্বা লম্বা মাস টানে আর ফেলে। | মন্টু ঘরের ভিতর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। নিতান্ত অভাবের ছাপ গোটা ঘরে। একটা নেড়া তক্তপোশ, কাঠের দুটো চেয়ার ও একটা টেবিল। দেয়াল-তাকে উাই করা একগাদা পুরনো খাতা। দেয়ালে পেরেকে ফুলছে একটা রঙ-চটা ছাতা—এমনই সব জিনিস। সবই ধুলোমলিন।

খানিক ধাতস্থ হয়ে মন্টু আবার বিশ্বনাথের দিকে চোখ ফেরায়। অর্জুন সিং ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের চেয়ারের পিছনে সরে গিয়ে, গোঁফে তা দিতে দিতে লক্ষ করছে মন্টুর হাবভাব।

কঠিন চোয়াল মন্টুর তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে, বিশ্বনাথ অসহায় ভঙ্গিতে ছটফট করে ওঠে। ওর গলা দিয়ে অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ বেরোয়। ছুরিটা খাপে পুরে প্যান্টের পকেটে রেখে, চাপা কড়া গলায় মন্টু প্রশ্ন করে প্রাক্তন বিশে গুন্ডাকে, 'আমায় চিনতে পারছ?”

'না না।' বিশ্বনাথ ঘাড় নাড়ে।

'অনেক বছর আগে। কুড়ি বছর। বাড়ি দখলের নামে একটা ছোট ছেলে আর তার, মাকে তাদের বাড়ি গিয়ে অপমান করেছিলে, মনে আছে?”

না না। হয়তো সত্যিই বিশের মনে নেই, অথবা সে মিথ্যে ভান করছে। ‘অসহায় ছেলেটাকে মেরেছিলে। তার মাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে। ঘরের জিনিসপত্র ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলে। মনে আছে?'

হাঁপাতে হাঁপাতে বিশ্বনাথ ঘাড় নাড়ে, না না, আমি না।

মন্টু এবার তার কোটের পকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে বিশ্বনাথের চোখের সামনে ধরে বলল, “দেখো, একে চিনতে পারো?

ফোটোটা মন্টুর মায়ের। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার ছবি। সযত্নে ফ্রেমে বাঁধানো এই ফোটোর বড় এক কপি মন্টুর কানপুরের বাসায় আছে।

বিশ্বনাথ বোধহয় আজকাল চোখে ভালো দেখে না। বেশ কিছুক্ষণ সে ছবিটা দেখে খুব কাছে ঝুঁকে। তারপর চিনতে পারে। কারণ মহাভয়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। হাঁপানির টানও বেড়ে যায়। ফ্যাসফেসে গলায় বলে ওঠে, ‘কে, কে তুমি?'

‘আমি সেই ছোট ছেলেটা। আমার মায়ের এই ফোটো। মায়ের ওপর সেই অত্যাচারের আজ শোধ নিতে এসেছি। ব্যঙ্গ মেশানো হিসহিসে গর্জন ছাড়ে মন্টু, এবার? সে ঘুসি বাগিয়ে ডান হাত তোলে বিশ্বনাথকে আঘাত করার জন্য।

মন্টুর ভয়ঙ্কর আক্রোশের আঁচে বিশ্বনাথ আরও কুঁকড়ে যায়। মরিয়া চেষ্টায় সে দু'হাত মেলে আত্মরক্ষার তাগিদে।

মন্টু কিন্তু অদ্ভুত আচরণ করে। তার উদ্যত হাত সহসা থমকে যায় শূন্যে। সে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেয় হাত। তারপর দু’পা পিছিয়ে গিয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে বিশ্বনাথের দিকে। তার ঠোঁট বেঁকে যায়, যেন চরম বিতৃষ্ণায়। এমন খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ সে অর্জুন সিংয়ের উদ্দেশে উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে, আরে দূর, একে কী মারব? এ লোকটা তো আধমরা। এর গায়ে হাত দিতে আমার ঘেন্না হচ্ছে। থাক এটা। তিলে তিলে মরুক। মা ঠিকই বলেছিলেন চলো। সে পায়ের বুট দিয়ে বিশ্বনাথের গায়ে একটা ঠোক্কর মেরে ঝটিতে পিছু ফেরে। ‘ঠারো।' সিংজির নির্দেশ শুনে আবার ঘুরে দাঁড়ায় মন্টু।

হুঁশিয়ার অর্জুন সিং পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাপড় আর খানিকটা দড়ি বের করে। বিশ্বনাথের মুখে কাপড় গুজে দিয়ে তার মুখ বাঁধে। দড়ি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধে তাকে। তারপর ভীষণ গলায় হুমকি দেয়, লেকিন এ নিয়ে ঝামেলা পাকালে, ফির এসে একদম খতম করে দেব। সমঝা?’

মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে যাওয়ায় বিশ্বনাথের তখন শোচনীয় অবস্থা। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কোনো রকমে নাক দিয়ে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে, ফেলছে। তাকে নজর করতে করতে সিংজি মিচকে হেসে বলল, না, বুড়া মরবে না। যবতক দশরথ না আসে, বাবা বিশসোনাথ থোড়া আরাম করুক।

ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে, মন্টু ও সিংজি বেরিয়ে যায়।

৯। অনুসন্ধানীর রহস্যভেদ ১১। মন কথা কয়না

Golpa

You may like these posts

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment

Indian Writters

Indian Writers

Bd Writters

Bangladeshi Writers

Popular Posts